Vol. 51 | No. 2 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# নজরুল-প্রবন্ধে বিদ্রূপের স্বরূপ


| | |
|---|---|
| Volume | 51 |
| Issue | 2 |
| Year | 2014 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | মাহবুবুল হক |
| Published online | February 1, 2014 |
| DOI | 10.62328/sp.v51i2.4 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v51i2.4 |
| Pages | ৬৯-৮১ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

# নজরুল-প্রবন্ধে বিদ্রূপের স্বরূপ

Check for updates

মাহবুবুল হক*

কাজী নজরুল ইসলাম মূলত কবি; এমনকি তাঁর গদ্যেও তিনি প্রবলভাবে কবিস্বভাবী। রোমান্টিকের প্রকৃতি-প্রেম-সৌন্দর্যচেতনা, আত্ম-আবিষ্কারের উচ্ছলতা নজরুলের কবিতা ও গানকে যতটা প্লাবিত করেছে প্রবন্ধকে ততটা না করলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন সেখানেও প্রবল জোয়ার সৃষ্টি করে। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যে বস্তুনিষ্ঠতা, যুক্তি ও চিন্তার নৈর্ব্যক্তিকতা এবং গভীরতা আবশ্যক তা সর্বাংশে অনুসরণ করার মতো যত্নশীল নজরুল নন বলেই চূড়ান্ত বিচারে এগুলোকে প্রবন্ধ বলা যায় কিনা সে প্রশ্ন বারবারই উঠেছে। তবে নজরুল নিজেই যখন কিছুটা পরিমার্জনার পর প্রবন্ধ হিসেবে কিছু লেখা প্রকাশ করেন অথবা নিখাদ প্রবন্ধ হিসেবেই কয়েকটি রচনা লেখেন তখন সেগুলো প্রবন্ধকার নজরুলের মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাময়িক প্রয়োজন বা সামাজিক কারণে লিখিত হলেও তা নজরুলেরই ব্যক্তিত্বকে প্রকারান্তরে প্রতিফলিত করে বলে এ জাতীয় রচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। বিশেষত আমরা যখন অবগত হই যে, নজরুলের প্রবন্ধ রচনা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাংবাদিক জীবনের প্রতিভাস তখন এগুলো আলাদা তাৎপর্য পায়। কারণ বাংলা প্রবন্ধের সাথে সংবাদ সাময়িকীর রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; সাহিত্য ও সাংবাদিকতা পরস্পর পরিপূরক হয়ে সমৃদ্ধ করেছে বাংলা প্রবন্ধের প্রস্তুতি পর্বকে। উনিশ শতকের শেষার্ধের গণেশ দেউস্কর এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মতো প্রবন্ধকার; দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ-এর মতো প্রখ্যাত সাংবাদিক-প্রবন্ধকারদের উত্তরাধিকারী হিসেবে নজরুলের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও তিনি মূলত সাহিত্যিক এবং তারপর প্রচারক-রাজনীতিক। রাজনীতি নজরুলের প্রবন্ধের সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়। ফলে ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ জাগরণী বক্তব্য এসব প্রবন্ধে অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে। অনেকটা বিবেকানন্দের মতো উগ্র প্রচারক নজরুল, সমর্থক সন্ত্রাসবাদের। উচ্ছ্বাসময় লিখিত বক্তৃতার আঙ্গিকে তরুণদের আকৃষ্ট করার উজ্জীবনী মন্ত্র তিনি ছড়িয়েছেন গদ্যে। তাই সাময়িক পত্রের প্রয়োজন আর 'গণরঞ্জন' এই দুয়ে[১] মিলে নজরুলকে এক প্রচারমুখী সমাজমনস্ক সম্পাদকে পরিণত করেছিল। নজরুলের এসব লেখা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আরও কারণ হলো, এগুলোর মধ্যে 'তাঁর বিশেষ একটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিচয় মুদ্রিত। বিষয়গত দিক ছাড়াও নজরুলের বিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যয়জাত একটি চেতনা প্রবন্ধগুলি থেকে আবিষ্কার করা যায়' (মনজুর মোরশেদ, ১৯৯২ : ১)। রচনাগুলোর অধিকাংশই সাময়িক প্রয়োজনে লিখিত হলেও সাময়িকতার সীমা অতিক্রম করে কালোত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছে। গুণবিবেচনায় প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অভিভাষণ, সম্পাদকীয় বা পুস্তক সমালোচনা যে নামেই অভিহিত হোক না-কেন তাতে নজরুলের ব্যক্তিত্ব ও শৈলীর বিশেষত্ব ধরা পড়েছে বলেই এগুলো বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

---

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

নজরুলের পাঁচটি গ্রন্থ তৎকালীন ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করেছিল এবং আরও পাঁচটি ছিল নিষিদ্ধ করার জন্য অপেক্ষমাণ তালিকায়।[২] তন্মধ্যে প্রথম নিষিদ্ধ গ্রন্থ *যুগবাণী* একটি প্রবন্ধগ্রন্থ। নজরুলের প্রবন্ধ রচনার কাল ১৯২০ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত প্রায় সাত বছর। তবে ১৯২২ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে নজরুল সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ', অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' ও সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকায় নজরুলের সম্পাদকীয় নিবন্ধসমূহ ও অন্যান্য কিছু লেখা *যুগবাণী* (১৯২২), *রাজবন্দীর জবানবন্দী* (১৯২৩), *দুর্দিনের যাত্রী* (১৯২৬) এবং *রুদ্র-মঙ্গল* (১৯২৬) এই চারটি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে *যুগবাণী* ২১টি, *রাজবন্দীর জবানবন্দী* ১টি, *দুর্দিনের যাত্রী* ৭টি এবং *রুদ্র-মঙ্গল* ৮টি প্রবন্ধের সংকলন। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় *ধূমকেতু* নামে আরেকটি প্রবন্ধগ্রন্থ যা তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের আগ্রহে প্রধানত 'ধূমকেতু' পত্রিকা থেকে সংকলিত সম্পাদকীয় রচনার সংগ্রহ।[৩] এছাড়া নজরুলের অগ্রন্থিত প্রবন্ধের সংখ্যা ৪৩টি।[৪] তাঁর কয়েকটি অভিভাষণ প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হলেও অধিকাংশই অগ্রন্থিত থেকে যায়। প্রবন্ধকারের সুস্থিরতা নজরুলের রচনায় পাওয়া যায় না। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মতো অকপট, দ্ব্যর্থহীন, প্রবল প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলোর মধ্যে যুক্তি ও প্রজ্ঞার প্রতিনিধিত্ব না থাকলেও রয়েছে স্বতোৎসারিত স্বজাতি-স্বদেশপ্রেম এবং তজ্জাত ভাবোচ্ছ্বাস। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষায় —

> সামাজিক রচনায় তিনি আত্মমুগ্ধ নন, সমাজপ্রবুদ্ধ; আত্মসচেতনতার বদ্ধ কৌটার ভেতর আটক থাকার কোন প্রবৃত্তি তাঁর নেই — তিনি বেরিয়ে এসেছেন, এক হয়ে গেছেন বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। তাঁর চোখে কান্না নেই, কণ্ঠে ক্রোধ আছে। চিন্তার গভীরতা যদি না থাকে বক্তব্যে গভীর আস্থা আছে। (সিরাজুল, ১৯৯১ : ১৯৪)

জাতীয় জীবনের সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহে নজরুলের তীক্ষ্ণ নজর এসব গদ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নজরুল বিভিন্ন প্রবন্ধে বিদ্রূপের আশ্রয় নিয়েছেন কিছুটা যুগপ্রভাবে[৫] এবং কিছুটা টিকে থাকার লড়াইয়ের অস্ত্র হিসেবে। পত্রিকায় সমকালের বিভিন্ন ঘটনা বা প্রকাশিত লেখা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার ধারা সেই ঈশ্বর গুপ্তের কাল থেকে চলছিল। নজরুলের সমকালে 'মোহাম্মদী', 'শনিবারের চিঠি', 'প্রবাসী', 'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ', 'নওবাহার'-সহ কয়েকটি পত্রিকায় এ ধারা অব্যাহত ছিল। নজরুলের বিভিন্ন লেখা নিয়ে স্থূল রসিকতাযুক্ত অশৈল্পিক ভাষায় বিদ্রূপ করার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় এসব পত্রিকায়; এমনকি ব্যঙ্গাত্মক রচনার মাধ্যমে তাঁর কোনো কোনো লেখাকে হাস্যাস্পদ করে তোলার চেষ্টাও কেউ কেউ করেছেন।[৬] মোহিতলাল মজুমদার, নীরদচন্দ্র চৌধুরী-র মতো খ্যাতিমান সাহিত্য সমালোচক যেমন নজরুলের বিরুদ্ধে অসাহিত্যিকসুলভ লেখায় অবতীর্ণ হয়েছেন তেমনি সজনীকান্ত দাস বা গোলাম মোস্তফাও (নজির আহমদ ছদ্মনামে) তাদের সীমিত সামর্থ্যকে নজরুল সমালোচনাতেই নিঃশেষ করেছেন। এমনকি মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-ও নজরুলকে 'কাফের' 'শয়তান' প্রভৃতি আক্রমণাত্মক শব্দযোগে অভিহিত করেছিলেন।[৭] নজরুলের বিরুদ্ধে এতসব বিদ্রুপের কারণ যাই হোক তাতে ঈর্ষাপরায়ণতা ও রুচির দৈন্য ছিল প্রকট। অবস্থা এতটাই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল যে, নজরুল বিমর্ষ ও হতাশ হয়ে লেখেন —

> পুলিশের জুলুম আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওদের জুলুমের তবু একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জুলুম করতে শুরু করে, তার আর পারাপার নেই। এরা তখন হয়ে ওঠে টিক্‌টিকে পুলিশের চেয়েও ক্রূর, অভদ্র। যেন চাক-ভাঙা ভীমরুল। জলে ডুবেও নিষ্কৃতি নেই, সেখানে গিয়েও দংশন করবে।
> পলিটিক্সের পাঁকের ভয়ে পালিয়ে গেলাম নাগালের বাইরে। মনে করলাম, যাক, এতদিনে একবার প্রাণ ভরে সাহিত্যের নির্মল বায়ু সেবন করে অতীতের গ্লানি কাটিয়ে উঠব। ও বাবা! সাহিত্যের আসর যে পলিটিক্যাল আখড়ার চেয়েও নোংরা, তা কে জানত! (নজরুল, ২০১১ : ১৯২)

এই শ্লেষ শেষ পর্যন্ত বেদনাহত হতাশায় রূপ নেয় এবং নজরুল টিকে থাকার লড়াইয়ে অন্যের বিরুদ্ধে বিদ্রূপবান ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজেকে শাণিত করে তোলেন। 'শরৎচন্দ্র তাঁর বই বিক্রয়ের আয় দিয়ে পথের কুকুরের জন্য মঠ নির্মাণ করবেন' এমন এক তথ্য দিয়ে নজরুল মন্তব্য করেন—

> শরৎ-দা সত্যিই একজন মহাপুরুষ। সত্যিই আমরা সাহিত্যিকরা কুকুরের জাত। কুকুরের মতই আমরা না খেয়ে এবং কামড়াকামড়ি করে মরি। তাঁর সত্যিকার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে, তিনি সাহিত্যিকদের অবতার-রূপে দেখতে পেয়েছেন।
> আজ তাই একটিমাত্র প্রার্থনা, যদি পরজন্ম থাকেই, তবে আর যেন এদেশে কবি হয়ে না জন্মাই। যদি আসি, বরং শরৎচন্দ্রের মঠের কুকুর হয়েই আসি যেন। নিশ্চিন্তে দুমুঠো খেয়ে বাঁচব। (নজরুল, ২০১১ : ১৯৮)

এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে হতাশা-জড়িত অভিমান খুব স্পষ্ট। 'বিদ্রোহী' কবিতার বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি 'আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়'-এর মতো অভিমান-ক্ষোভ-ব্যথার প্রযত্নে নজরুল-মানস লালিত, বিকশিত এবং প্রতিষ্ঠিত। এই তিন হৃদয়াবেগ নজরুলের অপরাপর সৃষ্টিকর্মের মতো প্রবন্ধ শৈলীকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিভাস রূপে। এর সঙ্গে 'বেপরোয়া দিলখোলা ফুর্তিবাজ' (বুদ্ধদেব, ১৯৮৪ : ১২৬) নজরুলকে মিলিয়ে নিতে গেলে তাঁর স্বভাবের অনির্দেশ্যতা এবং অস্থিরতা প্রকট হয়ে ওঠে। নজরুলের প্রবন্ধ তাই ভাবাবেগপ্রবণ কাব্যিক গদ্যের জন্য যতটা আলোচিত, বিদ্রূপ-শ্লেষমিশ্রিত রসাত্মক রচনা হিসেবে ততটা বিবেচিত নয়। অথচ নজরুলের প্রবন্ধ রচনার একটা প্রধান লক্ষ্যই ছিল তাঁর লেখা বা কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সমকালীন লেখকদের বিভিন্ন অযৌক্তিক অভিযোগ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জবাব দেয়া। ফলে নজরুলের প্রবন্ধ কেবল উদ্দীপনামূলক তেজোদীপ্ত জাগরণী বাণী হয়েই থাকেনি এতে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার কৌশল হিসেবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের নানারূপও ধরা পড়েছে। প্রথম-প্রকাশিত প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' থেকেই নজরুল-গদ্যের এমন শৈলী স্পষ্ট হয়ে যায়। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একটি লেখার প্রত্যুত্তরে সমালোচনার ভাষাকে রসাত্মক বাক্যবিন্যাসে আকর্ষণীয় করে তুলতে নজরুল একই সাথে যুক্তি ও শ্লেষের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তুর্ক নারীরা মোটেও সুন্দর নয় — হেমেন্দ্রকুমারের এমন মতকে অগ্রাহ্য করে নজরুল লিখলেন,

> তুর্কদের দেশ পাশ্চাত্য দেশেরই অন্তর্গত, আর তা নেহায়েত দূরও নয়, অথচ বাবা 'আদমের কাল হতে আজ পর্যন্ত তুর্ক রমণীদের মুখচন্দ্র কেউ দেখেননি? এবং খামাখা ঘরের খেয়ে

> বেচারিদের রূপ বর্ণনায় মুখে ফেনা উঠিয়েছেন? আর ঐ আমেরিকান লেখক মহাশয় একজন "হাম্বা চোম্বা" অবতারের মত সটান তুর্কস্থানে অবতীর্ণ হয়ে সারা দুনিয়ার চোখের উপরকার একটা মস্ত পর্দা ফাঁক করে ধরলেন? লেখকের "কেরদানি"কে বাহাদুরি দিতে হয় কিন্তু ! আর হেমেন্দ্র বাবুও সানাইয়ের পোঁ ধরার মত তাঁর দগ্ধ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছেন যে হুরপরী দেখা আর তাঁর ভাগ্যে ঘটলো না। তাই দুধের সাধ ঘোলে মিটানোর মত গানে-গল্পে-কবিতায় প্রসিদ্ধা হুরপরী নামে আখ্যাতা তুর্ক রমণীর রূপ-মাধুর্য শুনেই কোন রকমে নিজের 'আকুল পিয়াসা' দমন করে রেখেছিলেন, — এমন সময় 'দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠের' মত সশরীরে আমেরিকান লেখক মশায় মৃত্তিকা ভেদ করে উঠে একেবারে 'চিচিং ফাঁক' করে দিলেন এবং মাঝ মাঠে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন। আসল তুর্ক রমণীরা (দো-আঁসলা নয় অবশ্য!) বাস্তবিকই হুরপরীর চেয়েও সুন্দরী। (নজরুল, ২০১১ : ১৫৮)

বিদ্রূপের এই ভাষা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল প্রবন্ধকার নজরুলের মধ্যে। ঔপনিবেশিক শক্তি ও সাহিত্যিক প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করতে অথবা সাম্প্রদায়িক হিংসা-দ্বেষ, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় আক্রান্ত বাঙালি-মুসলমান-হিন্দুর ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে আক্রমণের জন্য নজরুল বেছে নিয়েছিলেন বিদ্রূপের ভাষা। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের মাধ্যমে সকল অন্যায়-অবিচার-শোষণ-বঞ্চনার জবাব দেয়ার এক অনমনীয় প্রতিজ্ঞা ছিল নজরুলের। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ-কে লেখা এক চিঠিতে নজরুল জানাচ্ছেন — পতিত, আত্মবিস্মৃত সমাজকে জাগাতে মোলায়েম স্বরে পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার পথ নজরুল অনুসরণ করতে আগ্রহী নন কিংবা স্নেহের হাত বুলিয়ে 'সাইকিক কিওর'-এও আস্থা নেই তাঁর। আঘাত-প্রত্যাঘাত করে অস্ত্র-চিকিৎসকের নির্মমতায় রোগ নিরাময়ের পদ্ধতিতেই নজরুলের আস্থা (নাসিরউদ্দীন, ১৯৮৮ : ১৪৪, ১৪৫, ১৪৯)। তাই বিভিন্ন প্রবন্ধে বারবার আঘাতের দেবতাকে আহ্বান করেন তিনি।[৮] শব্দ-শরে চেতনার দৈন্যকে আঘাত করার প্রয়াস নজরুল সাহিত্যের সর্বত্র বিদ্যমান। "বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে,/দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে/রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,/তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা" — 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতার এমন পঙ্‌ক্তির পিছনে আঘাত-প্রত্যাঘাত ও বেদনা-নিপীড়নে বিক্ষত এক অভিমানী অন্তর্জগতের পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুল মানসে অভিমানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ক্ষোভ ও দ্রোহের শব্দমালা। অভিমান ক্ষোভে রূপান্তরিত হয়ে যখন প্রত্যাঘাতে রূপ পায় তখন তা হয় 'পুঁতে ফেলা', 'পিষ্ট বা দগ্ধ করা', 'গর্দান বা টুঁটি চেপে ধরে মেরে ফেলা'র মতো নৃশংস, কখনও লাথি বা বেত্রাঘাতের মতো ভীতি উদ্রেককারী[৯] আবার কখনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মতো অপমানসূচক।

প্রতিবাদ ও ঘৃণার তীব্রতা যখন বিদ্রূপের ভাষারূপ পায় তখন তা সরাসরি ধিক্কার বা আক্রমণের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী অস্ত্রের মতো আঘাত করে প্রতিপক্ষকে। এমন এক বিদ্রূপের উদাহরণ 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' প্রবন্ধ। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত জেনারেল ডায়ারকে নিন্দার পরিবর্তে অভিনন্দন জানানোর মাধ্যমে এ প্রবন্ধে নজরুল যে-প্রতিপক্ষকে বিদ্রূপের আঘাতে জর্জরিত করেন সে-প্রতিপক্ষ, নজরুলের ভাষ্যে আর কেউ নয়, পরাধীনতায় নিমজ্জিত, আত্মস্বার্থপরায়ণ, আত্মসম্মানবোধহীন ভারতবাসী। পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে কুখ্যাত রৌলাট আইন প্রয়োগের সুবিধা নিয়ে

ব্রিটিশ শাসকদের বেতনভোগী দেশীয় সৈন্যদের ব্যবহার করে এক নির্মম হত্যাযজ্ঞে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল ও-ডায়ার। কিন্তু দুঃখজনক হল, ইতিহাসের এই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি কিংবা সাধারণ মানুষের মধ্যেও কাঙ্ক্ষিত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হয়। নানাভাবে এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ আয়োজনের চেষ্টার পর ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ শাসকদের দেয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু একই উপলক্ষে নজরুল তাঁর স্বভাবজাত দ্রোহ ও আক্রমণের পথই বেছে নিলেন; নিহতদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের প্রস্তাবকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি 'অমৃতসরের কসাই' হিসেবে কুখ্যাতি পাওয়া ডায়ারের জন্যও একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের প্রস্তাব করলেন নজরুল— আক্রমণের তীর ডায়ারের দিকে নয়, তাঁর প্রিয় ভারতবাসীর দিকে। নজরুলের বিদ্রূপখচিত শব্দ-বাণ থেকে উদাহরণ—

> অন্ধ আমরা আমাদের অবস্থা দেখিতে পাইতেছিলাম না, — সে অন্ধত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছে এই ডায়ার! আমাদের এই নির্লজ্জ কাপুরুষতাকে ভীম পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়াছে এই জেনারেল ডায়ার। গোলামের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধ কি রকম তাহাই সে নির্মম কঠোরভাবে জানাইয়া দিয়াছে। অন্য প্রতারকদের মতো গলায় পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়া আদর দেখাইতে যায় নাই সে — সে নারীর সাম্‌নে উলঙ্গ করিয়া মেথরের হাতে বেত্র দিয়া তোমার পিঠের চামড়া তুলিয়াছে! গর্দানে পাথর চাপা দিয়া বুকের উপর হাঁটাইয়াছে, তাহাদের পায়ে তোমাদিগকে সিজ্‌দা করাইয়া ছাড়িয়াছে। — আর, তবে তোমরা জাগিতে পারিয়াছ! তোমাদিগকে জাগাইতে চাই এমনি প্রচণ্ড নির্মম কসাই-শক্তি! এত নির্মমভাবে, এমন পিশাচের মতো বেত্রাঘাত না করিলে তোমরা জাগিতে না, তোমার মা-বোনদের সামনে উলঙ্গ করিয়া হাত-পা বাঁধিয়া পশুর মতো না পিটাইলে তোমাদের আত্মসম্মান-জ্ঞান ফিরিয়া আসিত না! ডায়ারের বুট এমন করিয়া তোমাদের মুখের সামনে তোমাদের আত্মীয়-আত্মীয়ার মুখে এমনি করিয়া থুথু না দিলে তোমাদের মানব-শক্তি ক্ষেপিয়া উঠিত না! — তাই আজ আমরা ডায়ারকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতেছি, "খোদা তোমার মঙ্গল করুন। (নজরুল, ২০১১ : ২৩)

উপরের দুটি উদ্ধৃতিতেই নজরুলের বিদ্রূপ প্রকাশিত, তবে দুই রূপে — একটি ব্যঙ্গাত্মক অপরটি শ্লেষাত্মক; একটির 'রসাঘাত কশাঘাতেরই মত তীব্র ও ঝাঁঝালো' (নজরুল, ২০১১ : ২১৭) অপরটির তির্যক ভাষাভঙ্গি আক্রোশ-বিষসমেত তীক্ষ্ণ ফলা হয়ে বিদ্ধ করে অন্তরাত্মা।

নজরুলের বিদ্রূপের লক্ষ্য মূলত ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী, বাঙালি মুসলিম, নজরুল-বিদূষক ও পরাধীন ভারতবাসী। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধ সংস্কারানুগত্য, তা হিন্দু বা মুসলিম যে সম্প্রদায়ই হোক, নজরুলের শব্দবাণে জর্জরিত হয়েছে। বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান সমাজের জড়ত্ব, আলস্য, কর্মবিমুখতা, ক্লৈব্য, অবিশ্বাস, পশ্চাৎপদতা, হীনম্মন্যতাকে তিনি বারবার আঘাত করেছেন বিদ্রূপের ভাষায়। একদিকে দ্রোহের উজ্জীবনী মন্ত্রে মুসলমান তরুণদের আহ্বান করেছেন পুরোনো সংস্কার ভেঙে নতুন আদর্শ গড়ে তোলার জন্য অন্যদিকে বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন তাদেরকে যারা এ পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, যারা নতুনকে স্বাগত জানাতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। দেশের কাজে 'নিরীহ জীবরূপী' এমন ছেলে

নজরুল চান না যাদের 'গোর্দা' নেই। 'মেদা মারা' নয় 'ডাংপিটে' তরুণ কামনা করেছেন তিনি। বাঙালি মুসলমানের পশ্চাৎপদতাকে তিরস্কার করে নজরুলের বক্তব্য—

> চোগা-চাপকান দাড়ি-টুপি দিয়া মুসলমান মাপিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর আর সব দেশের মুসলমানদের কাছে আজ আমরা অন্তত পাঁচ শতাব্দী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। যাহারা বলেন, "দিন ত চলিয়া যাইতেছে, পথ ত চলিতেছি" তাহাদের বলি ট্রেন, মোটর এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়িতে শুইয়া দুই ঘণ্টায় এক মাইল হিসাবে গদাই-লস্করি চালে চলিবার দিন আর নাই। যাহারা আগে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সঙ্গ লইবার জন্য আমাদের একটু অতিমাত্রায় দৌড়াইতে হয় এবং তাহার জন্য পায়জামা হাঁটুর কাছে তুলিতে হয়, তাই না হয় তুলিলাম। ঐ টুকুতেই কি আমার ঈমান বরবাদ হইয়া গেল? ইসলামই যদি গেল, মুসলিম যদি গেল, তবে ঈমান থাকিবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া? (নজরুল, ২০১১ : ১৩৬)

আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙালি মুসলমানের অনীহা, ভাষা-সাহিত্য-শিল্পচর্চায় তাঁর অনাগ্রহ এবং এসবের উপর ধর্মীয় বিধি-নিষেধের ফলে বাঙালি মুসলমানের প্রকৃত সাংস্কৃতিক বিকাশ অসম্ভব হয়ে পড়ছে বলে নজরুল মনে করতেন। এ সূত্রে তাঁর অভিযোগের তির আরবি-ফারসি জানা বিদ্বান মুসলিমদের প্রতি—

> কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাঙলাও ভাল করে শেখে না, তার আবার আরবি-ফার্সি। কাজেই ন' মন তেলও আসে না, রাধাও নাচে না। আর যাঁরা ও ভাষা শেখেন, তাঁদের অবস্থা — "পড়ে ফার্সি বেচে তেল!" আর তাদের অনেকেই শেখেনও সেরেফ হালুয়া-রুটির জন্য। কয়জন মৌলানা সাহেব আমাদের মাতৃভাষার পাত্রে আরবি-ফার্সির সমুদ্র মন্থন করে অমৃত এনে দিয়েছেন জানি না। সে অমৃত তারা একা পান করেই 'খোদার খাসি' হয়েছেন। (নজরুল, ২০১১ : ১৫১)

নজরুলের বিদ্রূপ কশাঘাতে পরিণত হয়েছে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দ্বন্দ্ব উন্মোচন করতে গিয়ে। তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ বা অভিভাষণের অনেকাংশ জুড়ে আছে সমকালের এই ঘৃণ্য ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই দুই সম্প্রদায়ের বৈরী সম্পর্কের ছাপ পড়েছিল ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সর্বত্র। হিন্দুর ছোঁয়াছুঁয়ি বাতিককেই এই দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কোন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করতেন নজরুল। আবার মুসলমানের কূপমণ্ডূকতা ও দ্রোহাচারের অভাবকে তিনি বড় দুর্বলতা মনে করেন। মোট কথা, হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে না-জানার কারণেই এত সংঘাত-সংঘর্ষ ও প্রাণক্ষয়। এই বিভেদ মোচনের চেষ্টা না করে দুই সম্প্রদায় বরং হানাহানিতে লিপ্ত; নজরুল তাই বিদ্রূপের ভাষায় লেখেন—

> এক খুঁটিতে বাঁধা রামছাগল, এক খুঁটিতে বাঁধা খোদার খাসি, কারুর গলার বাঁধন টুটল না, কেউ খুঁটি মুক্ত হল না, অথচ তারা তাল ঠুকে এ ওঁকে ঘুঁস মারে! দেখে হাসি পায়। (নজরুল, ২০১১ : ২৬৪)

তাঁর মতে, এই পাশবিক আচরণ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ মানুষকে বড় ভাবার শিক্ষা। মানবতাই হতে পারে সম্প্রীতির সবচেয়ে বড় নিয়ামক। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ঘৃণ্য চক্রান্তে পড়ে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হলেও নজরুল মনে করতেন এর

জন্য সাধারণ মুসলমান বা হিন্দু দায়ী নয়, দায়ী 'হিন্দুত্ব' আর 'ইসলামত্ব', সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় যারা আত্মনিয়োগ করে তাদেরকে পশুর সাথে তুলনা করে এবং 'শয়তানের চেয়েও বীভৎস, শূকরের চেয়েও কুৎসিত' আখ্যা দিয়ে হিংসায়, কদর্যতায় নজরুল তাদের গায়ে 'অনন্ত নরকের দুর্গন্ধ' (১১৭) ছড়িয়ে দিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। নজরুলের ভাষায়—

> হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব ! তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব! এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। (নজরুল, ২০১১ : ১২৩)

বিদ্রূপের আক্রমণ থেকে রাজনৈতিক নেতাদেরও রেহাই দেননি নজরুল। মসজিদ আর মন্দিরকে কেন্দ্র করে মানুষে-মানুষে এই আত্মবিনাশী সংঘাত সৃষ্টির জন্য রাজনৈতিক স্বার্থ এবং দূরভিসন্ধির গোপন সম্বন্ধ গড়ে উঠছে, নজরুল তা জানতেন বলেই তাঁর ক্ষোভ-মিশ্রিত বিদ্রূপের লক্ষ্য হয় তারাই যারা 'মানুষের পশু-প্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্ম-মদান্ধদের নাচাইয়া' কাপুরুষ থেকে মহাপুরুষ হয়ে যায় (নজরুল, ২০১১ : ১২২)। এই শ্রেণির রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি নজরুলের ঘৃণা ও তিরস্কার ভাষারূপ পায় এভাবে—

> মন্দির-মস্‌জিদের সামনে বাজনা বাজাইলে হয় তার প্রতিকার, আসে তার জন্যে মুদ্রা হাজার হাজার, আসে তার জন্য ছপ্‌পর ফুঁড়িয়া নেতার দল— গো-ভাগাড়ে শকুনি পড়ার মত! — শুধু দশ লক্ষ লাশের আর প্রতিকার হইল না! (নজরুল, ২০১১ : ১২২)

দ্রোহের ভাষাই নজরুলের প্রিয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু বিদ্রোহের লড়াই বাহ্য, লক্ষ্য সেখানে প্রকাশ্য। অথচ প্রকাশ্য প্রতিপক্ষই সবসময় লক্ষ্য নয় আবার অপ্রকাশ্য প্রতিপক্ষকে দ্রোহের ভাষায় আক্রমণ করাও সবসময় কার্যকর পন্থা হয় না। তাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই নজরুল ব্যবহার করেন যাদের তিনি আক্রমণ করতে চান একেবারে অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত। বিদ্রূপই এক্ষেত্রে মোক্ষম অস্ত্র যাতে বাহ্যিক আঘাতের চেয়ে মানসিক যন্ত্রণাই পীড়া দেয় বেশি। তাই নজরুল তাঁর সমালোচকদের বিরুদ্ধেই এ অস্ত্রটির অব্যর্থ ব্যবহার করেছেন বারবার। লেখার জবাব লেখার মাধ্যমে দেওয়ার মননশীল চর্চা অব্যাহত রেখে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নজরুল যেসব নিবন্ধ লিখেছেন সেগুলোতে আক্রমণের অস্ত্র হিসেবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু অব্যাহত গালি-গালাজ, 'গাড়োয়ানি রসিকতা' ও 'মেছোহাটা থেকে টুকে-আনা গালি'র (১৯১) বিপরীতেও নজরুল লেখকসুলভ পরিমিতি রক্ষা করেছেন লক্ষণীয় মাত্রায়। 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় শ্রী তারানাথ রায় (তারা-রা) কৃষক-শ্রমিক দলের মুখপত্র 'গণবাণী'র সমালোচনা করে যে পত্র লেখেন তার জবাবে নজরুল যে পত্র দিয়েছিলেন তা বিদ্রূপের শিল্পিত ভাষ্যে অনন্য হয়ে আছে। তারা-রা মহাশয়কে 'গণবাণী' অফিসে সানুনয় আমন্ত্রণ জানিয়ে নজরুলের তির্যক শব্দশর ''গণবাণী' মুজফ্‌ফর আহমদ' শিরোনামের লেখায় ভাস্বর হয়ে আছে —

> গেলে দেখতে পাবেন, বহু হতভাগ্যের পদধূলি "গণবাণী" অফিসে স্তূপীকৃত হয়ে "গণবাণী" — কেও ছাড়িয়ে উঠেছে। যে অফিসে মাদুরের চেয়ে মেঝেই বেশি, চেয়ার টেবিলও নঞতৎপুরুষ সমাস। মানুষগুলির অধিকাংশই মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। অবশ্য খাবার বেলায় বহুব্রীহি। বাজ-পড়া, মাথা-ন্যাড়া তালগাছের মত সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে চোখে জল আসে, বিশেষ করে যখন দেখি, "গণবাণী"র কর্ণধার হতভাগ্য মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে। অবস্থা ত সব — "ফকির-ফোকরা, হাড়িতে ভাত নেই, শানকিতে ঠোকরা।" আর শরীরের অবস্থা তেমনি। যেন সমগ্র মানবসমাজের প্রতিবাদ। (নজরুল, ২০১১ : ২৩৬)

পরিহাসও যে কখনও কখনও বিদ্রূপে পরিণত হয়, এই লেখা তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। 'গণবাণী' অফিসে বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের যেসব কর্মীর যাওয়া-আসা ছিল তাদের করুণ অবস্থাকে পরিহাসের মর্মান্তিক রসিকতায় দগ্ধ করে নজরুল প্রকারান্তরে তারানাথ রায়কেই বিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন, আঘাত করেছেন তার বিবেচনাবোধকে। নজরুলের স্বভাবজাত দ্রোহীরূপ এখানে অনুপস্থিত। অনভিপ্রেত সমালোচনার জবাবে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেছেন কারুণ্য উদ্রেককারী ভাষায়, তাকে গ্লানিবোধে দগ্ধ করতে। একই লেখার অন্যত্র এই ভাষা আরও বিদ্রূপাত্মক—

> লেখককে তাঁর ইলেকট্রিক ফ্যান শীতলিত এবং লাইট উজ্জ্বলিত, ড্রয়ার টেবিল ডেস্ক পরিশোভিত, দারোয়ান দণ্ডায়িত, ত্রিতল অফিসকে ত্যাগ করে একটু নীচে নেমে (লিফট দিয়ে) তাঁদের অফিসের মোটরে করে আমাদের 'গণবাণী' অফিসের ও তার কর্ণধারদের দেখে যাবার নিমন্ত্রণ রইল। বুভুক্ষুগুলো অন্তত তাঁর পয়সায় একটু চা খেয়ে নেবে। ... বাড়ির হাঁড়িতে ইঁদুরেরা বক্সিং খেলছে, ডন খেলছে। ক্যাপিটালিস্টরা আমার চেয়েও সেয়ানা, তারা বলে "হাত বুলাতে হয় , গায়ে বুলোও বাবা, মাথায় নয়, তোমার হাত খরচটা মিলে যাবে, কিন্তু ও কর্মটা হবে না দাদা। এমন-কি মুজফ্‌ফরের মত সুঁটকি হয়ে মর-মর হলেও না।" (নজরুল, ২০১১ : ২৩৮)

নজরুলের এই ভাষাভঙ্গি আক্রমণাত্মক নয়— আত্মরক্ষামূলক। কিন্তু প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে দুর্বল করতে অনেক বেশি কার্যকর। বিচিত্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামী নজরুল খুব ভালো করেই জানতেন এই চিঠি কেবল তারানাথ রায়ের সমালোচনার জবাবই নয়— 'গণবাণী'র প্রচারও। এই সতর্কতা পত্রিকা সম্পাদনার প্রভাবজাত বলে মনে হয়। বস্তুত এ কারণেই নজরুল প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে শুরু করেন । ইংরেজ সরকার কর্তৃক একের পর এক গ্রন্থ নিষিদ্ধ হওয়া, কারাবাস-নির্যাতন-হুমকি নজরুলকে হতোদ্যম করতে পারেনি। তিনি তাঁর অবস্থান থেকে সরেও আসেননি বা লেখার ক্ষেত্রে সাবধানতাও অবলম্বন করেননি। উপরন্তু আরও তীব্র ও প্রকাশ্য প্রতিবাদে আত্মনিয়োগ করতে রাজনৈতিক দল গঠন করে রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে শাসক শক্তির বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিলেন।

নজরুল তাঁর প্রবন্ধে আমলাতন্ত্র, নারীর অবরোধ-প্রথা, মানবতার অবমাননা এবং দেশের রাজনৈতিক হালচালের বিরুদ্ধে বিদ্রূপের শাণিত অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। আমলাতন্ত্র সম্পর্কে নজরুলের ক্ষোভ ও ঘৃণা ভাষারূপ পেয়েছে কয়েকটি প্রবন্ধে[১০]। জাতির উপর ব্যুরোক্রেসি দানবের উৎপীড়ন, বন্ধন এতটাই প্রবল ছিল যে তাকে 'দানব' আখ্যা দিয়ে

তার 'বিষদাঁত' ভাঙার প্রয়োজনীয়তা নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন (নজরুল, ২০১১ : ১৮০, ১৮১)। তবে 'আমলাতন্ত্র' ও 'ব্যুরোক্রেসি' শব্দ দুটিকে নজরুল ব্রিটিশ রাজশক্তি ও সরকারের সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন বলে অনুমিত হয়। এটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নজরুলের সাবধানতার পরিচয় বহন করে, এমন ধারণা অযৌক্তিক হবে না। যেমন—

> আমলাতন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের শক্তি পরীক্ষা করতে হলে কাউন্সিল ভেঙ্গে দেওয়া যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ... এবং ব্যুরোক্রেসি শাসন যে নেহাত ভুয়ো ছেলেখেলা ও আমাদের সকল অমঙ্গলের আদি নিদান তা প্রতিপন্ন করে গভর্নমেন্টের গিল্‌টি করা মুখোস খুলে তার বিকৃত স্বরূপ ভালো করে দেখাতে পারা যে একান্ত দরকার আর তাতে যে অসহযোগীদের ভাবগত অশ্রদ্ধা হবে না– এই হচ্ছে এক দলের মত। (নজরুল, ২০১১ : ১৬৯)

কিন্তু সাংবাদিকসুলভ সতর্কতা দেখানোর পরও বিদ্রূপ-বাণ থেমে থাকেনি। আমলাতন্ত্রের কার্যকলাপকে 'আমলায়ন' শব্দের কূটাভাসে ব্যঙ্গ করে 'যুগবাণী'র 'মুখবন্ধ' নিবন্ধে নজরুল লিখলেন—

> নন-কো-অপারেশন হইতেছে বিছুটি বা আলকুসী এবং আমলাতন্ত্র হইতেছে ছাগল! ছাগলের গায়ে বিছুটি লাগিলে যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে, আমলাতন্ত্রও তেমন অসহযোগিতা-বিছুটির জ্বালায় বে-সামাল হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ... আমলাতন্ত্রের গায়েও বিছুটি লাগিয়াছে এবং তাই তিনি কখনো জলে নামিতেছেন, কখনো ডাঙায় ছুটিতেছেন, আর কখনো বা দেওয়ালে গা ঘেঁসড়াইয়া খামখা নিজেরই নুনছাল তুলিতেছেন! তবু কিন্তু জ্বলন আর থামিতেছে না, বরং ক্রমেই বাড়িতেছে। এখন এই আমলাতন্ত্রের ল্যাজের ডগা হইতে মাথার চুল পর্যন্ত সমস্ত কিছুই এত অস্বাভাবিক রকমের বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা দেখিলে হাসিও পায়, কান্নাও আসে। (নজরুল, ২০১১ : ৪১, ৪২)

মুসলিম নারীর অবরুদ্ধ জীবন-যাপনকে 'শ্বাসরোধ' আখ্যা দিয়ে নজরুল তরুণদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তাদের উদ্ধার করে মুক্ত পৃথিবীর স্বাদ নেওয়ার সুযোগ দিতে, অশিক্ষার অন্ধকার থেকে তাদের শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে। স্বাধীনতার মর্ম মাতা-ভগিনীরা অনুধাবন না করলে হীনবীর্য সন্তানের জন্ম হবেই— এই ছিল নজরুলের বিশ্বাস। এ বিষয়ে 'তরুণের সাধনা' প্রবন্ধে নজরুলের ভাষ্য—

> আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত লোকই চাকুরে, কাজেই খরচের সঙ্গে জমার অঙ্ক তাল সামলাইয়া চলিতে পারে না। অথচ ইহাদের পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশি। আর ইহাদের বাড়িতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষ্মায় ভুগিয়া মরিতেছে আলো-বায়ুর অভাবে। এই সব যক্ষ্মারোগগ্রস্ত জননীর পেটে স্বাস্থ্য-সুন্দর প্রতিভা-দীপ্ত বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া। ফাঁসির কয়েদীরও এইসব হতভাগিণীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে। (নজরুল, ২০১১ : ১৩৬)

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সওগাত'-এ নজরুল 'চানাচুর' নামে একটি ফিচার লিখতেন নিয়মিত। সেটি এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে পাঠকের মধ্যে 'সওগাত' নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। সাম্প্রতিক কোনো বিষয়কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ভাষায়

পাঠকের মধ্যে উপস্থাপন করাই ছিল এসব নকশাধর্মী লেখার উদ্দেশ্য। এতে আঞ্চলিক ভাষা, প্রবাদ-প্রবচন ও প্রচল কথ্যভাষা ব্যবহার করে হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে নজরুল সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। পাঠকচিত্ত আকৃষ্ট করাও যে এ ধরনের রচনার একটি উদ্দেশ্য তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। তারুণ্য ও বার্ধক্যের দ্বন্দ্ব নিয়ে কয়েকটি চানাচুর-পর্বের একটি থেকে উদাহরণ —

> বড় মিঞাদের আজ পরিষদে অর্থাৎ "আ্যাসেমব্লিতে" বিবাহ আইন বিল পাস হতে দেখে বুড়োদের দল মুক্ত-কচ্ছ হয়ে চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছেন — গেল রাজ্য, গেল মান, ধর্ম কর্ম সব গেল।
>
> বটেই ত। বেচারাদের তৃতীয় পক্ষ চতুর্থ পক্ষের যে দফা নিকেশ হল তা হলে! মেয়েগুলো বিয়ে হবার আগে ডাগর-ডুগর হয়ে গেলে যে সব বুঝে ফেল্‌বে। তখন কি আর ফোক্‌লাদন্তী চুপসায়িত কপোল অষ্টাবক্রীয়-কটী বুড়োদের ওরা বিয়ে করতে চাইবে? ইয়া আল্লা! ই' কি গজব! (নজরুল, ২০১১ : ২৭৬)

নজরুল-প্রবন্ধের ভাষা আলঙ্কারিক; বিষয়ের প্রয়োজনে কখনও কাব্যিক কখনও শ্লেষ-বক্রোক্তিমিশ্রিত বিদ্রূপাত্মক। শব্দের ধ্বনিসাম্য ব্যবহার করে বিদ্রূপাত্মক বাক্য নির্মাণ-কুশলতাও প্রায়ই লক্ষ করা যায়, যা সুভাষণ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অনন্য। যেমন[১১]—

> ১। আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ "হনুকরণে" পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। (নজরুল, ২০১১ : ৬৬)
>
> ২। শত্তুরে যেন ইহাকে গোলামখান বই তেলাম-খানা না বলিতে পারে। (নজরুল, ২০১১ : ৭১)
>
> ৩। ফুল-ফোটানোর চেয়ে হুল-ফোটানোতেই যাঁদের আনন্দ (নজরুল, ২০১১ : ১২৬)
>
> ৪। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। (নজরুল, ২০১১ : ১২৯)
>
> ৫। ইহাদের ফতুয়া-ভরা ফতোয়া! ... এই ফতুয়াধারী ফতোয়াবাজদের হাত হইতে গরিবদের বাঁচাইতে যদি কেহ পারে ত সে তরুণ। (নজরুল, ২০১১ : ১৩৫)
>
> ৬। আমাদের বাঙলা দেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে একেবারে শ্বাস-রোধ বলা যাইতে পারে। (নজরুল, ২০১১ : ১৩৬)
>
> ৭। টাইটেলের বা টাই ও টেলের মায়া যদি বিসর্জন না করিতে পারি, তবে আমাদের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর-পরাহত। (নজরুল, ২০১১ : ১৩৮)
>
> ৮। বাগ্‌দেবী যে আজকাল বাগ্‌দিনী হয়ে বীণা ফেলে সজনে কাঠের ঠেঙ্গী বাজাচ্ছেন, তাও দেখতে পাবেন। (নজরুল, ২০১১ : ২৩৩)
>
> ৯। ভারতমাতার বল-দ (বলদানকারী) পুত্রদের মধ্যে এই নিয়ে এরই মধ্যে মোচ্ছবের ধূম লেগে গেছে। (নজরুল, ২০১১ : ২৭৪)

'যুগবাণী'র ২১টি এবং বাকি প্রবন্ধের অন্তত ১৬টি সাধু ভাষায় লেখা। তবে এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট কারণ চিহ্নিত করা যায় না। ভাষণের জন্য লিখিত গদ্যে তিনি যেমন সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন তেমনি ভাবগম্ভীর কোনো বিষয়, যা সাধুভাষায় লেখাই ছিল স্বাভাবিক, লিখেছেন চলিত ভাষায়। তবে প্রবন্ধচর্চার শুরুর দিকে অধিকাংশই সাধু ভাষায় লেখা। যেখানে নজরুল আবেগমথিত গদ্যে তরুণদের আবাহন-গীতি শোনান সেখানে

তিনি উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকের রূপময় সজ্জায় গদ্যকে সুললিত ও কাব্যিক করে তোলেন; আবার যেখানে তিনি জাগরণের উচ্ছ্বাসে প্রতিপক্ষকে আঘাত-প্রত্যাঘাতের প্রবল শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হন সেখানে ওজস্বিতাপূর্ণ শব্দ-সম্ভারে প্রলয় ও প্রাখর্য সঞ্চারিত। বিদ্রূপের ক্ষেত্রেও তাই। সাহিত্য বিচারে প্রবন্ধ দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। তবে 'গদ্যলেখক হয়ে তিনি জন্মাননি, কিন্তু গদ্যও তিনি লিখেছেন, এবং গদ্যে যে তাঁর অতিমুখর মনের অসংযত বিশৃঙ্খলা সবচেয়ে দুঃসহ হয়ে প্রকাশ পাবে, সে তো অনিবার্য' বুদ্ধদেব বসুর (১৯৮৪ : ১২৯) এমন সিদ্ধান্ত নজরুল-প্রবন্ধ মূল্যায়নে আংশিকভাবে প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কারণ সকল দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও নজরুলের প্রবন্ধ বা নিবন্ধ সময়ের প্রয়োজন মিটিয়ে স্থান করে নিয়েছে মানুষের মনে; দুঃসহ তা যদি হয়েই থাকে তবে সেটি ব্রিটিশ রাজশক্তি এবং পরাধীন সমাজের অন্ধত্ব-ক্লীবত্বের অনুগামীদের কাছে। সাময়িকতার অভিযোগ ছাড়াও বক্তব্যের আবেগপ্রবণ উচ্ছ্বাসময়তা এবং অস্থিরতা নজরুলের প্রবন্ধকে 'যুগের হুজুগের' মতোই ঝলকিত প্রকাশে পরিণত করেছে। কিন্তু এই ঝলকের মধ্যেই 'বক্তব্যের ওজস্বী আন্তরিকতা, অকৃত্রিম স্বাদেশিকতা আর অপরিসীম মানবতাবোধ' (আতোয়ার, ১৯৯৪ : ৮১) প্রবন্ধকার নজরুলের সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে পাঠকরুচির নৈকট্য ও দেশপ্রেমিকের হৃদ্‌স্পন্দনের সম্মিলনে এক বিশেষ প্রবণতার পরিচায়ক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে অবস্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

## টীকা

১. এ প্রসঙ্গে আতোয়ার রহমানের (১৯৯৪ : ৭০) বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য — 'তাঁর প্রবন্ধে ( এবং আরো অনেক রচনায় ) সাময়িকতার এই প্রাধান্যের কারণ দ্বিবিধ। সমকালীন রাজনীতির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় রচনায় সাময়িক বিষয়ের চর্চার অপরিহার্যতা। সাময়িক বিষয়ও অবশ্যই উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে। কিন্তু উপরি-উক্ত দুটি কারণ যেখানে প্রবল, সেখানে রচনায় প্রসাদগুণ সৃষ্টি দুরূহ — বিশেষ করে, তার লক্ষ্য যদি থাকে গণরঞ্জন। নজরুল গণরঞ্জনই চেয়েছিলেন।'

২. শিশির কর-কে উদ্ধৃত করে এ তথ্য জানিয়েছেন তিতাশ চৌধুরী (২০০১ : ১১৩) । প্রসঙ্গত, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (১৯৯২ : ২) নজরুলের চারটি প্রবন্ধগ্রন্থই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল বলে যে মন্তব্য করেছেন তা তথ্যভিত্তিক নয়। নজরুলের বাজেয়াপ্ত গ্রন্থগুলো কালানুক্রমে—*যুগবাণী*, *বিষের বাঁশী*, *ভাঙার গান*, *প্রলয়-শিখা* ও *চন্দ্রবিন্দু*। *অগ্নি-বীণা*, *সর্বহারা*, *রুদ্র-মঙ্গল*, *ফণি-মনসা* ও *সঞ্চিতা* বাজেয়াপ্তির জন্য প্রস্তাবিত হলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। বিস্তারিত — আনোয়ারুল হক (২০০০) ও সৈকত আসগর (১৯৯০)।

৩. নজরুল ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র*-তে 'ধূমকেতু' নামে গ্রন্থের উল্লেখ নেই। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ-ও চারটি প্রবন্ধ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। আব্দুল কাদির সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত *নজরুল রচনাবলী*-তে প্রবন্ধ গ্রন্থ পাওয়া যায় ৪টি। আমাদের বিবেচনায়, নজরুলের জীবদ্দশায় 'ধূমকেতু' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলেও এটি তাঁর সম্মতিতে বা তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছে এমন কোনো তথ্য জানা নেই। সে কারণে 'ধূমকেতু'কে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ না করাই যুক্তিযুক্ত।

৪. নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত *নজরম্নলের প্রবন্ধ সমগ্র* (২০১১)-তে ৪৩টি প্রবন্ধকে অগ্রন্থিত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. বিশ শতকের প্রথম তিন দশকেই সাংবাদিকতার সাথে ভাবাবেগপ্রধান রচনার দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। অর্থাৎ 'সাংবাদিক নজরুলের আবির্ভাব ঘটে ভাবাবেগের অবনতির যুগে। কিন্তু বয়সে তিনি তখন তরুণ এবং প্রকৃতিগত কারণে অতি চঞ্চল। যুগপ্রভাব তাঁকে তাই সর্বদা সংযত রাখতে পারেনি।'— আতোয়ার রহমানের (১৯৯৪ : ৭১) এই বক্তব্যের সাথে একমত হয়েই বলা যায় যে-যুগপ্রভাব নজরুলকে অসংযমী করেছে একই প্রভাব তাকে ভাবগাম্ভীর্যের প্রাবন্ধিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে চটুল প্রবন্ধকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৬. মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, গোলাম মোস্তফা, আব্দুল হাকিম প্রমুখ নজরুলের গান-কবিতা-গজল নিয়ে অসাহিত্যিকসুলভ, অযৌক্তিক সমালোচনা ছাড়াও ব্যাঙ্গাত্মক রচনা বা প্যারোডি রচনাতেও মনোনিবেশ করেছিলেন। বিশেষ করে 'বিদ্রোহী' কবিতার কয়েকটি প্যারোডি রচনা করেছিলেন সজনীকান্ত দাস, গোলাম মোস্তফা, গোলাম হোসেন, আব্দুল হাকিম। এছাড়া *সাম্যবাদী*-র 'কুলি-মজুর' *পূবের হাওয়া*-র 'ফুল কুড়ি' কবিতা বা *বুলবুল*-এর 'কে বিদেশী বনউদাসী' গজলের প্যারোডি রচিত হয়েছিল। বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য—আনোয়ারুল হক (২০০০)।

৭. মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পর্কে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য— 'স্বীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি মত ও আদর্শ পরিবর্তন করতেন! যেমন, কাজী নজরুল ইসলামকে 'কাফের', 'শয়তান' রূপে চিত্রিত করেও পরবর্তীকালে তিনি 'মোহাম্মদী'র জন্য নজরুলের কবিতা ও গান পাবার জন্য তাঁর দ্বারস্থ হয়েছিলেন!' (নাসিরউদ্দীন, ১৯৮৮ : ১৯৪)

৮. গেছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ'!, আমি সৈনিক, রুদ্র-মঙ্গল, নিশান-বরদার ইত্যাদি প্রবন্ধ।

৯. বিভিন্ন প্রবন্ধে তরুণদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে নজরুল সহিংস আঘাত-প্রতিশোধ-আক্রমণের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। সেগুলোর কিছু কিছু রীতিমত ভয়ংকর, বীভৎসও বটে। এ কারণে নজরুলকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর। কয়েকটি উদাহরণ—

– 'যে রক্ষণশীল বৃদ্ধ এতটুকু "টু" করিবে, তাহার গর্দান ধরিয়া এই মুক্তির দিনে বাহির করিয়া দাও। যে আমাদের পথে দাঁড়াইবে তাহার টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফেল। শুধু মানুষ বাঁচিয়া থাক ভাই, – ভারতে শুধু চিরকিশোর মানুষেরই জয় হউক!' — *ছুঁৎমার্গ* (নজরুল, ২০১১ : ৩৮);

– 'মারের মত বড় জিনিস এখনো সৃষ্টি হয়নি দুনিয়ায়' — *কামাল* (নজরুল, ২০১১ : ১৭৯) ;

– 'মনের কোণে বসে যদি কোন ছিচকাঁদুনি সংস্কার-বুড়ি তোমার আঁচল ধরে পিছনে টেনে রাখতে চায়, তবে তাকে নির্মমভাবে লাথি মেরে তোমার জীবন-গৃহের চতুঃসীমা হতে বাহির করে দাও।'—*আজ চাই কি* (নজরুল, ২০১১ : ২০২) ;

– 'আমাদের এই বিজয়-মঙ্গলের সময় যদি কেউ বাধা দিতে আসে তবে তাকে ধড় থেকে অর্ধেক ছাড়িয়ে নিয়ে অর্ধেক সাগর জলে ভাসিয়ে দাও আর অর্ধেকখানা সেখানে পড়ে দু'পায়ের গিঁটে গিঁটে যেন ঠোকাঠুকি করে।'—*নিশান বরদার* (নজরুল, ২০১১ : ১৭৪)

১০. ধর্মঘট, মুখবন্ধ, মুশকিল, ভাববার কথা— প্রবন্ধগুলোতে আমলাতন্ত্র বা ব্যুরোক্রেসি সম্পর্কে নজরুলের মন্তব্য পাওয়া যায়।

১১. বাক্যাংশগুলো যথাক্রমে সত্য শিক্ষা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিভাষণ (৩ ও ৪), তরুণের সাধনা (৫, ৬ ও ৭), 'গণবাণী ' মুজফ্ফর আহ্মদ, চানাচুর (ডোমনী স্টেটাস) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

**মূল গ্রন্থ**

কাজী নজরুল ইসলাম (২০১১)। *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

## গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি


আতাউর রহমান (১৯৯৩)। *নজরুল : ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

আতোয়ার রহমান (১৯৯৪)। *নজরুল বর্ণালী*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ।

আনোয়ারুল হক (২০০০)। *নজরুল ও তাঁর বৈরী পক্ষ*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (১৯৯২)। *নজরুলের প্রবন্ধ সাহিত্য*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

তিতাশ চৌধুরী (২০০১)। *নজরুলের নানা দিক*, মুক্তধারা, ঢাকা।

বুদ্ধদেব বসু (১৯৮৪)। *কালের পুতুল*, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন (১৯৮৮)। *সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৯১)। 'নজরুল ইসলামের গদ্য রচনা', নজরুল *ইসলাম : নানা প্রসঙ্গ*, (সম্পাদক : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

সৈকত আসগর (১৯৯০)। *নজরুলের গদ্য রচনা : ভাবলোক ও শিল্পরূপ*, অস্ট্রিক পাবলিশার্স, ঢাকা।